The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

ইংরেজি শিক্ষার প্রয়াস (১৮০০-১৮৫০) : উনিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্তের রূপান্তর–একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

[Striving for English (1800-1850) : The Transformation of the Bengali Middle Class in the Nineteenth Century — A Critical Appraisal]

Dr. Mortuza Khaled
Professor, Department of History, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 25 February 2025
Received in revised: 10 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Bengal Renaissance, English Education in 19th-century Bengal, Social Mobility in colonial Bengal.

ABSTRACT

This paper examines the transformation of the Bengali middle class in early colonial Bengal (1800–1850) through their pursuit of English education. Driven by economic aspirations and social mobility, the Bengali Hindu middle class embraced English learning, leading to the establishment of numerous schools and colleges, culminating in the University of Calcutta in 1857. This educational shift facilitated access to British administrative roles and sparked the Bengal Renaissance, fostering cultural awakening, social reforms, and the eradication of practices like sati. Figures like Rammohan Roy and Vidyasagar played pivotal roles in this modernization, blending Western rationalism with indigenous traditions. However, this class also faced criticism for opportunism and complicity with colonial rule, reflecting a complex duality in their social and political roles. The paper underscores how English education catalyzed a broader socio-cultural and political transformation, laying the foundation for Indian nationalism.

ভূমিকা

আঠার শতকের শেষাংশে এবং উনিশ শতকের প্রথমে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজী ভাষা শেখার প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠে। ফলে উনিশ শতকের প্রধমার্ধে সারা বাংলায় গড়ে উঠে শত শত ইংরেজী ভাষা শেখার স্কুল ও কলেজ এবং শেষে ১৮৫৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে একদিকে তাদের জন্য যেমন চাকুরীসহ জীবিকার এক বড় দ্বার উন্মুক্ত হয় অপর দিকে পাশ্চাত্যের শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের সংস্পর্শে এসে বাংলায় সংঘটিত হয় এক অভূতপূর্ব নব জাগরণ যাকে বেঙ্গল রেঁনেসা নামে অভিহিত করা হয়। এই সাংস্কৃতিক নবজাগরণ বাঙালির মনোজগৎ কে উন্মুক্ত করে, কুসংস্কার দূর করে, নিজেদের আত্মীক উন্নয়ন ঘটায়। বাঙালির মধ্যে সৃষ্টি করে স্বদেশ প্রেম, দূর করে ধর্মান্ধতা। এর প্রেক্ষাপটে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র, বিকেকানন্দের মতো সমাজ সংস্কারকের আর্বিভাব ঘটে। ই নবজাগরণের পিছনে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগ্রহ ছিল মূল চালিকাশক্তি, যা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির বাসনা নয়—বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের সূচনা করে। ইংরেজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে এবং পশ্চিমা ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সমাজে আধুনিকতা, যুক্তিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রচার ঘটায়। এই শ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষায় ঝুঁকে পড়ার পেছনে একদিকে ছিল অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সামাজিক মর্যাদা ও আধুনিক জীবনের অন্বেষণ। পাশাপাশি, এই শিক্ষার প্রসারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন—যেমন উইলিয়াম কেরি, ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায় প্রমুখ—তাঁদের অবদানও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই প্রক্রিয়া ছিল একমাত্রিক নয়; এর মধ্যে জটিল দ্বৈততা ছিল। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, তেমনি তারা একপর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসনের সহযোগী ও সুবিধাভোগী শ্রেণীতেও পরিণত হয়। এই দোদুল্যমান অবস্থান থেকেই তাদের চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মধ্যে নানা রকম বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়—যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সমাজ চিন্তকদের সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এ সবই ছিল ইংরেজী শিক্ষার সুফল। বর্তমান লেখায় আলোচনা করা হবে বাঙালি মধ্যবিত্ত কখন, কেন এবং কিভাবে ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে তা। বিষয়টি আলোচনা করার আগে আলোচনা করা প্রয়োজন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে বলতে কোন সামাজিক শ্রেণীকে বোঝাত।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞা সর্বদা এক ও অভিন্ন ছিল না। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সময়ের সাথে সাথে পরিবর্ধিত ও পরিশীলিত হয়েছিল। আঠার শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত, উনিশ শতকের প্রথম দিককার বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং বিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত এক রকম নয়। সময়ের সাথে সাথে তাদের মন জগতে পরিবর্তন এসেছে এসেছিল চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার দিকে তাদের ঝুঁকে পড়ার কারণ অনুসন্ধানের আগে সংজ্ঞায়িত এবং চিহ্নিত করা প্রয়োজন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে কি বোঝায়? বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে যে শ্রেণীকে বোঝায় তা কিন্তু হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মুসলমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্থিত্ব আঠার শতক থেকে শুরু করে পুরো উনিশ শতকে ছিল না। উনিশ শতকের শেষ দশকে এসে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের উত্থান শুরু হয়। আমাদের বর্তমান আলোচ্য সূচীর বাইরের বিষয় সেটি। সুতরাং আমরা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে যে শ্রেণীকে বোঝাব তা হলো বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটা শুরু হয় উনিশ শতকের প্রারম্ভে। ১৭০০ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ান নিযুক্ত হয়ে আসেন মুর্শিদ কুলী খান।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব

মুসলিম শাসনামলে উপমহাদেশসহ বাংলাদেশে শিক্ষিত, স্বচ্ছল ও রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব অজানা ছিল।[১] বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে নতুন ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে তাতে বাঙালি সমাজের নবোদ্ভূত শক্তিগুলো ইংরেজ শাসকদের সহযোগী একটি শ্রেণী হিসেবে বিকশিত হয়।[২] অবশ্য এ শ্রেণী সৃষ্টির পটভূমি রচিত হয়েছিল আরও পূর্বে মুর্শিদ কুলী খান কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় থেকে। মোগল শাসনামলে বাংলার সমাজ বিভক্ত ছিল দুই শ্রেণীতে। শাসক অভিজাত শ্রেণীর যার অন্তর্গত ছিল বিদেশী তুর্কী, আফগান ও পারসিক মুসলমানগণ। এরা ছিল বিদেশ থেকে আসা অবাঙালি মুসলমান। সমগ্র মোগল শাসনামলে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র। স্থানীয় জনগণ তা হিন্দু বা মুসলমান--হোক প্রশাসনিক কার্য থেকে দূরে রাখা হতো। এ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল সুবাদার-দেওয়ান-জায়গিরদার-আমলা-কর্মচারীদের পিরামিড সাদৃশ্য বিরাট এক প্রশাসনিক কাঠামো ও সেনাবাহিনীর উপর--- কোন বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ বিশেষ কোন শ্রেণী বা জনস্তরের উপর নয়।[৩]

মুর্শিদ কুলী খান বাংলার এই শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটান। ১৭০০ সালে মোঘল শাসনের ক্রান্তিলগ্নে মুর্শিদ কুলী খানকে সুবা বাংলার দিউয়ান নিযুক্ত করেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। সে সময় বাংলা থেকে যে রাজস্ব আসতো তা প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য খরচ করা অর্থের চাইতে কম ছিল। অন্য সুবা থেকে অর্থ এনে এর ঘাটতি পূরণ করা হতো। মুর্শিদ কুলী খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর, প্রশাসনিক কাজে তুর্কী আফগান ও পারসিকদের স্থলে স্থানীয় বাঙালি হিন্দু অভিজাতদের নিয়োগ দান করা শুরু করেন। তার অন্যতম কৃতিত্ব ছিল নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন । তিনি ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করে সেগুলিকে ২৫টি জমিদারী ও ১৩টি জায়গীরে রূপান্তর করেন।[৪] মুর্শিদ কুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের ফলে অচিরেই বাংলায় প্রশাসক ছাড়াও জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে স্থানীয় বাঙালি হিন্দু অভিজাতগণ। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলের ইতিহাসে এই প্রথম গুনগত এক পরিবর্তন আনেন মুর্শিদ কুলী খান--- রচিত হয় বাঙালি অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির পটভূমি।[৫] বরাবর ভারত উপমহাদেশে বিদেশী শাসক ও শাসন সম্পর্কে এ দেশীয় অধিবাসীদের কোন বৈরী মনোভাব ছিল না। ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল স্কট তার বন্ধু মি. নোবেলকে লিখেছিলেন, "হিন্দু রাজারা এবং দেশীয় লোকেরা মুসলমান শাসকদের প্রতি বিরূপ ছিল, এবং গোপনে তারা শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন কামনা করতো ও তাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার সুযোগ খুঁজতো।"[৬] নবাবি বা প্রাক-নবাবি যুগে যদিও বাংলাদেশ ছিল, কিন্তু আধুনিক অর্থে কোন বাঙালি জাতি ছিল না। তখন এ দেশীয় জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশ্ববাদী।[৭] বিদেশী হিসেবে পলাশী পরিবর্তনে ক্লাইভের ভূমিকাকে দিল্লীর সম্রাট বা সমকালীন বাঙালি অভিজাত শ্রেণী বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন নি।[৮] স্থানীয় বাঙালী অভিজাত শ্রেণী বরং এগিয়ে গিয়েছিল বৈদেশিক শক্তিকে সহায়তা করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে অধিকতর সংহত করার জন্য।

আঠারো শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া শুরু করে তার প্রভাব এই উপমহাদেশে এসেও লাগে। শিল্প বিপ্লবে সৃষ্ট যান্ত্রিক পণ্য নিয়ে এদেশে আসা শুরু করে ডাচ, ফ্রেঞ্চ, পর্তুগীজ এবং সবার শেষে ইংরেজ বণিকগণ। বাংলার কলকাতা, শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় গড়ে উঠে তাদের বাণিজ্যিক কেন্দ্র। পণ্য বিক্রি করা ছাড়াও তারা কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষকে ব্যবহার করা শুরু করে। শত শত বছর থেকে বিদ্যমান এ দেশীয় বিনিময়ভিত্তিক গ্রাম কেন্দ্রীক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া শুরু করে।[৯] মুদ্রাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ ঘটা শুরু করে। বিদেশী বণিকদের সাথে রপ্তানী বাণিজ্যের সাথে জড়িয়ে পড়ে এ দেশীয় নতুন এক বণিক শ্রেণী। আঠারো শতকে বাঙলায় নবাব, রাজা-মহারাজা, জায়গিরদার জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সরবরাহ বণিকদের বিশেষ বিকাশ ঘটে এবং তারা একটি উদীয়মান শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।[১০] বাণিজ্য ছাড়াও ব্যাঙ্কিং কারবার থেকে তারা খুব দ্রুতই অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়। সদ্য উত্থিত এই ধনাঢ্য শ্রেণী সনাতন মুগল অভিজাত শ্রেণীর চেয়ে অধিকতর অগ্রসর, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখার প্রয়াস পায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর রাষ্ট্রক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যায়। কোম্পানী শাসনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় সর্বোচ্চ পরিমাণে রাজস্ব আদায়। রাজস্বের উৎস ভূমি থেকে আরও অধিক হারে কর আদায়ের উদ্দেশ্যে তারা **১৭৯৩** সালে প্রবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো। একদিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারদের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবী এবং অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন এলাকার কৃষক বিদ্রোহ দমন এবং অন্যান্য যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোম্পানীর প্রয়োজন, এ দুই মেটানোর ক্ষেত্রে কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেকাংশে কার্যকরী হয়।[১১] এ বন্দোবস্তের নীতিতে সাড়া দিয়ে নবাবী আমলে সৃষ্ট হিন্দু অভিজাত ও জমিদারেরা নতুন করে জমিদারে রূপান্তরিত হয়ে ভূমির উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কর ধার্য করা হয়েছিল ভূমি জরিপ না করে এবং এ বন্তোবস্তে জমিদারগণ উচ্চহারে কর দেবার অঙ্গীকারে জমিদারী গ্রহণ করেছিলেন। সে পরিমাণে কর জমিদারী থেকে আদায় না হওয়ায় জমিদারেরা সংকটে পতিত হন। এছাড়া **১৭৯৩** সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরনো ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণী যার ভাগ্য মুসলিম রাজশক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল সে শ্রেণী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, উদ্ভব হয় নতুন এক অভিজাত শ্রেণীর।[১২] এ অভিজাত মুসলমানদের পতনের অপর কারণ ছিল কোম্পানী কর্তৃক লাখেরাজ সম্পত্তি গ্রাস। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিষ্কর লাখেরাজ জমি ভোগ করতেন। হিন্দুরা বিদেশী মুসলিম ও পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনাধীনে থাকায় সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর সচেতন থাকতো, তাদের সম্পদের দলির দস্তাবেজ রক্ষা করতেন। নিজেদের শাসকের জাত বিবেচনা করে মুসলমান অভিজাতগণ দলিল রক্ষার বিষয়ে হিন্দুদের মতো সচেতন ছিল না। ফলে দুর্বল দলিলের অজুহাতে কোম্পানী **১৭৯৩** খ্রিষ্টাব্দ থেকে **১৮২৮** খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নানা কৌশলে বহু লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এর ফলে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় মুসলিম অভিজাতগণ।[১৩] এভাবে আঠারো শতকের শেষে মোগল আমলের মুসলিম অভিজাত সামন্তশ্রেণী ধ্বংস হয়ে যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট মূলত হিন্দু জমিদার শ্রেণীর পতন ঘটাও শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সূর্যাস্ত আইনের ফলে। কোথাও কোথাও জমিদারের নতুন উদীয়মান ব্যবসায়ীর শ্রেণীর কাজে তাদের জমিদারীর একাংশ বিক্রি করে তাদের জমিদারী রক্ষা করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো ও তা থেকে অর্থ আদায় করার ক্ষেত্রে কোম্পানীর কঠোর আইনের ফলে অচিরেই বাংলায় অনেক স্তর বিশিষ্ট্য মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হয়। এ শ্রেণী ব্রিটিশ সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় করেছিল। বিষয় ঘোষের মতে, "উনিশ শতকে একশ্রেণীর ধনিক বাঙালির হাতে পর্যাপ্ত মূলধনও ছিল। এই ধনিক বাঙালিরা ইংরেজদের সংস্পর্শে নানাবিধ কাজকর্ম করে আঠারো শতকের মধ্যেই প্রভূত ধনসঞ্চয় করেছিলেন।"[১৪] এভাবে তাদের সঞ্চিত সম্পদ তারা পুনরায় বাণিজ্য বা শিল্পে ক্ষিনিয়োগ না করে তা জমিদারী বা তার অংশবিশেষ ক্রয়ের মতো অনুপাদনশীল খাতে তা বিনিয়োগ করে। "যে-পথে ধনিক বাঙালির ধনসঞ্চয় করেছেন সে-পথ নোংরা অলিগলিপথ, চোরাগলি পথ, সর্পিল ও সংকীর্ণ পথ। শিল্পোদ্যমবা উচ্চাকাঙ্খী কোন পরিকল্পনা গ্রহণের কোন দূরদর্শীতা বা মনোভাব তাদের ছিল না। তারা তাদের অর্জিত সম্পদ বিনিযোগ করে সহজ মাধ্যম ভূমিতে।"[১৫] আসলে উনিশ শতকে সমাজ ব্যবস্থায় ভূমি মালিক ও জমিদারীর অধিকারী হওয়া একটি অত্যন্ত সম্মানজনক বিষয় হয়ে দাঁয়িয়েছিল এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্মান ও আয়ের এই সহজ মাধ্যমটিকে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে।

এভাবে দেখা যায় উনিশ শতকের প্রথমদিকে ঔপনিবেশিক শাসকদের সহায়ক শ্রেণী হিসেবে বাংলায় নতুন এক সম্পদশালী শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে তার সদস্য ছিল মূলত অভিজাত হিন্দুগণ। উনিশ শতকের প্রথম থেকে কলকাতা শহর

বাংলার রাজধানী ও শক্তিশালী একটি বাণিজ্যিক শহর হিসেবে বিকাশ লাভ করা শুরু করে এবং উদীয়মান এই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী কলকাতা ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বাড়ী নির্মাণসহ সম্পত্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। তারা এ এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে। এ সময় কলকাতা শহরে বসতি স্থাপনকারী পরিবারগুলির অন্যতম ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, শোভাবাজারের রাজ পরিবার, হাটখোলার দত্ত পরিবার, কলুটোলার শীল পরিবার, রামবাগানের দত্ত পরিবার, বহুবাজারের বন্দোপাধ্যায় পরিবার, কলুটোলার শীল পরিবার, রামবাগানের দত্ত পরিবার, বহুবাজারের বন্দোপাধ্যায় পরিবার, কলুটোলার সেন পরিবার ও সলাঙ্গার দত্ত পরিবার ছিল অন্যতম।[১৬]

বাঙালি ভদ্রলোক

এভাবে যে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তাদের সহজ বাংলায় বলা হয় *ভদ্রলোক* । আঠারো শতকের শেষভাগে (১৭৫০-১৮০০ সালের দিকে) বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর উত্থানের প্রাক্কালে, যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঝোঁক এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি, তখন এই শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান, মানসিকতা ও রুচিবোধ ছিল ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন সবে শুরু হয়েছে, এবং বাংলার সমাজে মুঘল আমলের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এখনও প্রবল ছিল। এই সময়ের বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য) সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে উঠে এসেছিল। তারা জমিদার, তালুকদার, মধ্যস্থিত জমির মালিক বা মুঘল প্রশাসনের অধীনে কাজ করা "দেওয়ান" বা "নায়েব" হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, নবাবি আমলে কলকাতার ধনী বণিক পরিবারগুলো (যেমন: শোভাবাজারের রাজ পরিবার) এই শ্রেণীর প্রাথমিক রূপ ছিল।[১৭] এই শ্রেণীর ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ ছিল এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কাজে তাদের এক বড় অংশ জড়িয়ে পড়ে। এরা কোম্পানির বণিক-এজেন্ট (বানিয়ান) বা মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করত, যা তাদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করেছিল।[১৮] এই শ্রেণীর একটি অংশ গ্রামাঞ্চলে জমিদারি বা তালুকদারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল, অন্য অংশ কলকাতার মতো শহরে ব্রিটিশদের সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগে উঠে এসেছিল। শহুরে এলাকায় তাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে আধুনিক ছিল।[১৯]

এই সময়ে বাঙালি ভদ্রলোকদের রুচিবোধ ছিল ঐতিহ্যবাহী বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি। মঙ্গলকাব্য, ভক্তিমূলক সাহিত্য (যেমন: চৈতন্যচরিতামৃত), এবং পৌরাণিক কাহিনী তাদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। কবিয়াল, পাঁচালি, যাত্রা, এবং কথকতার মতো লোকসংস্কৃতি তাদের বিনোদনের মাধ্যম ছিল।[২০] মুঘল আমলে ফার্সি ছিল প্রশাসনের ভাষা, এবং অনেক বাঙালি ভদ্রলোক ফার্সি ও সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তারা প্রশাসনিক কাজে দক্ষ ছিলেন, যা পরে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের ঝোঁকের একটি ভিত্তি তৈরি করে।[২১] শহরের ধনী বাঙালি পরিবারগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সচেতনতা ছিল। তারা ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যে লাভবান হয়ে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে চাইত।[২২] তাদের জীবনধারা ছিল প্রথাগত। পোশাকের ক্ষেত্রে ধুতি-চাদর, পাগড়ি প্রচলিত ছিল। খাদ্যাভ্যাসে ভাত, ডাল, মাছ, মাংস (বিশেষ করে পাঁঠার মাংস) জনপ্রিয় ছিল। গ্রামীণ ভদ্রলোকদের জীবনযাত্রা তুলনামূলকভাবে সাধারণ ছিল, তবে শহুরে ভদ্রলোকরা বিলাসবহুল জীবনযাপনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠছিলেন।[২৩] শিক্ষা বলতে তখন সংস্কৃত, ফার্সি, বা বাংলা ভাষায় পড়াশোনা বোঝাত। পাঠশালা ও তৎকালীন গুরুকুল ব্যবস্থায় শিক্ষা দেওয়া হতো। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তখনও তৈরি হয়নি, কারণ এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট ছিল না।[২৪] এভাবে উনিশ শতকের শেষে যে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী হয় তারা ছিল সুযোগ সন্ধানী, ন্যায়-নীতি ও নৈতিকতা বিবর্জিত, অদেশপ্রেমিক এক শক্তি। তাদের সম্পর্কে সে সময়ের সাহিত্যিক, দার্শনিক বা বিবেক সম্পন্ন কোন মানুষের ভাল ধারনা ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল কোলকাতা কেন্দ্রীক এবং কোলকাতা নগরকে কেন্দ্র করেনই তাদের বিকাশ ঘটে। কিন্তু কলকাতার কর্মজীবন শিল্পকেন্দ্রিক ছিল না, ছিল বাণিজ্য ও প্রশাসনকেন্দ্রীক ফলে কোলকাতার নাগরিক জীবনের বিকাশের সাথে সাথে এক ধরনের অশিল্পকেন্দ্রিক প্রশাসনিক চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই চাকুরী লাভকারী শ্রেণীর মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্বল্প বেতনভোগী বিচিত্র এক ধরনের কর্মচারী যারা এক অর্থে কেরানী নামে অভিহিত করা যায়। আসলে কেরানী নামে যারা অভিহিত হতেন তাদের মধ্যে ছিল **`Writer' `Clerk' `Copyist'** প্রভৃতি পেশার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ। ১৮৪০-এর গোড়ার দিকে জনৈক বিদেশী পর্যটক কলকাতা শহরে ককারেল কোম্পানীর অফিসের কেরানীদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

> "In the lobby of the office, there are probably eight or a dozen native writers, some of them are seated on the ground with legs across, and having little books on their knee or on a small box before

them, others are seated at desks; some of these Bengalees are writing in their own language, others in English, their wages are form four to ten rupees monthly. In the common room, there are stay five or six East Indian `writers', having salaries of and from sixty to one hundred rupees, and generally there are about a dozen native writers, who have from eight to twenty rupees a month. On the upper floor are the European partners and European clerks rooms."[২৫]

দেশী বিদেশী সওদাগরি অফিসে সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে বাঙালি কেরানীদের সংখ্যা উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের কোলকাতায় বেশ বড় আকারের ছিল। তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল শাদা ধুতি চাদর, বেনিয়ান। কেরানী বাবুরা ধুতি পরতেন বেশ লম্বা করে কোঁচা দুলিয়ে। এ ছিল ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পর্বের চাকুরীজীবী বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্তের চিত্র। উদীয়মান বাঙালি মধ্যবিত্ত ছিল স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। ১৮৮১ সালেই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমকালীন পত্রিকা *সোমপ্রকাশ* মন্তব্য করেছে। "আমাদের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখাপড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া কৃতী হইবেন, তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে, স্বাধীন প্রবৃত্তি ও মত হইবে, চেষ্টা আমাদিগের অন্তকরণে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় স্থান প্রাপ্ত হয় না।"[২৬] একই ভাবে উনিশ শতকের জনপ্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালির চিত্র অঙ্কন করেছেন এভাবে,

> "জগদীশ্বর কৃপায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙালী নামে এক অদ্ভুদ জন্তু এই জগতে দেখা দিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পন্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রামন্ত; হসেন্ত পদে পাঁচ-পাঁদ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই এবং অস্থি ও মস্তিস্ক 'বাইমেনা' জাতির সদৃশ বটে। তবে অমন্তঃস্বভাব সন্মন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, তাহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অমন্তরে পশু (কতিপয় লাল দাড়িবিশিষ্ট ঋর্ষির মতো)। বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তোলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তির করিয়া সংগ্রহ পূর্বক এই অপূর্ব নব্য বাঙালি চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুত, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দভ হইতে গর্জন--- এই সকল একত্র করিয়া দিঙ্মন্ডল উজ্জ্বলকারী , ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন।"[২৭]

আবার বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রিত করতে গিয়ে বাঙালি বাবুদের সম্পর্কে তীব্র কটুক্তি প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন,

> "যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুন, মুখে দশগুন, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইস্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ "ন্যাশনাল থিয়েটার", তিনিই বাবু। যিনি মিসনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিক্ট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষায় ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।"[২৮]

এভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্ষোভ ও গ্লানি থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে চরিত্র চিহ্নিত করেছেন তাতে তার ক্ষোভ থাকলেও এ চিত্র বাঙালি মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে খুব বেশী অতিরঞ্জিত ছিল না। এভাবে দেখা যায় ব্রিটিশ শক্তির অনুগত শক্তি হিসেবে বাংলায় যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ তাদের না ছিল জাতীয়তবোধ বা জাতীয়তাবাদ। দেশপ্রেম, মানব কল্যাণের কোন মনোভাবই তাদের মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে ছিল না। অবশ্য দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ শুরু থেকেই এই উপমহাদেশে ছিল না। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদাব মন্তব্য করেছেন,

> "জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝায় ভারতবর্ষে তাহার অস্তিত্ব মধ্যযুগে ছিল না, প্রাচীন হিন্দু আমলেও ছিল কিনা সন্দেহ। .... যখন বাংলায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজশক্তি নেপাল, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিতে যুদ্ধযাত্রা করিত তখন বাঙালী নেতারা ইংরেজদের বিজয়ের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং যুদ্ধে অর্থসাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতেন। উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী রাজা রামমোহন রায়ও এই দলভুক্ত ছিলেন।"[২৯]

এভাবে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ার প্রসিদ্ধ মনীষী রাজা রামমোহন রায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে অনন্য উদার মত পোষণ করিতেন কিন্তু তিনিও মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির উল্লেখ করে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন যে, তিনি

ইংরেজদের ভারতে পাঠিয়ে হিন্দুদের নয়শত বর্ষব্যাপী মুসলমান লাঞ্ছনা ও অত্যাচার থেকে উদ্ধার করেছেন।[৩০] এই সময়ের অপর বাঙালী মনীষী প্রসন্নকুমার ঠাকুরও একই মনোভাব প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করে বলেছেন, ''ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও না ইংরেজের অধীন হইয়া থাকিতে চাও, আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলিয়া গ্রহণ করিব।[৩১] এই মনোভাব কেবল মুষ্টিমেয় হিন্দু নেতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু বাঙালি জনসাধারণ উনিশ শতকে এই মতই দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেন। এভাবে দেখা যায় যে, ''জাতীয় চেতনা বা স্বাধীনতার প্রেরণা অন্তত: বাংলা দেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছিল না।''[৩২]

১৭৯০-১৮৩৪ সালে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের কারণ

১৭৯০ থেকে ১৮৩৪ সালের মধ্যে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা "ভদ্রলোক" নামে পরিচিত, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তীব্র আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই আগ্রহ তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থানকে পুনর্নির্মাণ করে। এই শ্রেণীর চাপ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের নেতৃত্বে ইংরেজি ভাষাকে ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা ও প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। নিম্নে বাঙালি ভদ্রলোকদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঝোঁকের পেছনের কারণগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

অর্থনৈতিক সুযোগ ও প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পর (১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর) বাংলার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৭৯০-এর দশকে ফার্সি প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রাধান্য ধরে রাখলেও, ব্রিটিশ প্রশাসন ক্রমশ ইংরেজি ভাষার উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী, যারা ঐতিহ্যগতভাবে মুঘল প্রশাসনে ফার্সি শিক্ষার মাধ্যমে দেওয়ান বা নায়েব হিসেবে কাজ করত, বুঝতে পারে যে ইংরেজি শিক্ষা তাদের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগের দ্বার উন্মোচন করবে।

ইংরেজি জানা ব্যক্তিরা ব্রিটিশ প্রশাসনে কেরানি, আমলা, বা অন্যান্য লাভজনক পদে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ পেত। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতার ধনী বাঙালি পরিবারগুলো, যেমন শোভাবাজারের রাজ পরিবার বা ঠাকুর পরিবার, ব্রিটিশদের সঙ্গে বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কাজে যুক্ত হয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এই পরিবারগুলো ব্রিটিশ কোম্পানির বণিক-এজেন্ট (বানিয়ান) হিসেবে কাজ করত, যা তাদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করেছিল। ইংরেজি শিক্ষা তাদের এই অবস্থানকে আরও সুসংহত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।[৩৩] এছাড়া, ব্রিটিশদের জমিদারি ব্যবস্থা (১৭৯৩ সালের স্থায়ী বন্দোবস্ত) বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি করে। জমিদারি ব্যবস্থার মধ্যস্থিত কর্মচারী বা তালুকদার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তারা ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্য ইংরেজি শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।[৩৪]

সামাজিক মর্যাদা ও আধুনিকতার আকাঙ্ক্ষা

ইংরেজি শিক্ষা বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতো। ব্রিটিশ শাসনের প্রেক্ষাপটে ইংরেজি ভাষা জানা ব্যক্তিরা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারত, যা তাদের সমাজে একটি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করত। এই শ্রেণী নিজেদের ঐতিহ্যবাহী উচ্চবর্ণের (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য) পরিচয়ের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে নতুন একটি সামাজিক পরিচয় গড়ে তুলতে চাইত। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতি, দর্শন, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ তাদের মধ্যে আধুনিকতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল। রামমোহন রায়, যিনি বাংলা রেনেসাঁসের পথিকৃৎ ছিলেন, ইংরেজি শিক্ষাকে পশ্চিমা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ শেখার প্রবেশদ্বার হিসেবে দেখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজি শিক্ষা বাঙালি সমাজকে প্রাচীন কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবে এবং আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে।[৩৫]

এই সময়ে বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা একটি সামাজিক প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে ওঠে। যারা ইংরেজি শিখত, তারা সমাজে "শিক্ষিত" এবং "ভদ্র" হিসেবে স্বীকৃতি পেত। এই মর্যাদা তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানকে শক্তিশালী করত। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতার শহুরে ভদ্রলোক পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করত।[৩৬]

ব্রিটিশ প্রশাসনের নীতি ও ১৮৩৫ সালের সিদ্ধান্ত

ব্রিটিশ প্রশাসনের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বাঙালি ভদ্রলোকদের আগ্রহকে আরও উৎসাহিত করে। ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতে শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে, যা ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সহায়ক হয়। তবে, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বাঙালি ভদ্রলোকদের চাপই ১৮৩৫ সালের সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করে। ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের বিখ্যাত "Minute on Indian Education" প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয়দের মধ্যে একটি শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি করবে, যারা ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। বাঙালি ভদ্রলোকদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এই সিদ্ধান্তের পেছনে একটি প্রধান চালিকাশক্তি ছিল। ফলে, ১৮৩৫ সালে ইংরেজি ভাষাকে ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা ও প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।[৩৭] ১৭৯০-১৮৩৪ সালের মধ্যে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের মূলে ছিল অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার, সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের নীতিগত সমর্থন। এই শ্রেণী ইংরেজি শিক্ষাকে কেবল পেশাগত উন্নতির মাধ্যমই নয়, বরং সমাজের আধুনিকীকরণ ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের হাতিয়ার হিসেবেও গ্রহণ করে। তাদের এই সক্রিয় অংশগ্রহণ ও চাপের ফলে ১৮৩৫ সালে ইংরেজি ভাষা ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা ও প্রশাসনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বাংলার সমাজে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে এবং বাংলা রেনেসাঁসের ভিত্তি স্থাপন করে।

আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে ব্যক্তিদের ভূমিকা

১৮০০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি এবং সংগঠন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে এই ব্যক্তিরা এবং সংগঠনগুলি বাঙালি সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উইলিয়াম কেরি, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড, ডেভিড হেয়ার, রবার্ট মে, খিদিরপুরের জমিদার কালীশঙ্কর ঘোষাল, এবং কলকাতা স্কুল সোসাইটির প্রচেষ্টা বাংলা রেনেসাঁসের ভিত্তি স্থাপনে এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগ্রহ জাগাতে সহায়ক ছিল। নিম্নে তাদের ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪): উইলিয়াম কেরি, ব্যাপটিস্ট মিশনারি হিসেবে ১৭৯৩ সালে ভারতে এসে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইংরেজি, বাংলা, এবং সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করা হতো।[৩৮] কেরি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ এবং অভিধান তৈরি করেন এবং বাইবেলের বাংলা অনুবাদে অবদান রাখেন, যা ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সহায়ক ছিল।[৩৯] তিনি ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্য এবং পশ্চিমা বিজ্ঞান শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিত। এই কলেজ ১৮২৭ সালে ডেনমার্কের রাজা ফ্রেডরিক ষষ্ঠের রয়্যাল চার্টার লাভ করে, যা এটিকে ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা দেয়।[৪০] কেরির প্রচেষ্টা বাঙালি সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগাতে এবং আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. জশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭): জশুয়া মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উইলিয়াম কেরি ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের সঙ্গে "শ্রীরামপুর ত্রয়ী" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ১৮২৬ সালে ডেনমার্কের রাজা ফ্রেডরিক ষষ্ঠের কাছে গিয়ে কলেজের জন্য রয়্যাল চার্টার অর্জন করেন।[৪১] মার্শম্যান ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি চীনা এবং সংস্কৃত ভাষার শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি শ্রীরামপুরে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" (১৮১৮) এর সম্পাদনায় অংশ নেন, যা ইংরেজি শিক্ষার প্রচারে সহায়ক ছিল।[42]মার্শম্যানের প্রচেষ্টা বাঙালি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পশ্চিমা জ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

৩. উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩): উইলিয়াম ওয়ার্ড, শ্রীরামপুর ত্রয়ীর আরেক সদস্য, শ্রীরামপুর মিশনের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখেন। তিনি শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন এবং বাংলা, ইংরেজি, এবং অন্যান্য ভাষায় শিক্ষাগ্রন্থ প্রকাশ করেন।[৪৩] ওয়ার্ডের মুদ্রণ কার্যক্রম ইংরেজি শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকের সহজলভ্যতা বাড়ায়। তিনি শ্রীরামপুর কলেজের পাঠ্যক্রম তৈরিতে সহায়তা করেন, যা পশ্চিমা শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত হয়।[৪৪] ওয়ার্ডের অকাল মৃত্যু (১৮২৩) সত্ত্বেও, তার কাজ শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষামূলক কার্যক্রমে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

৪. ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২): ডেভিড হেয়ার, একজন স্কটিশ ঘড়ি নির্মাতা, ১৮০০ সালে কলকাতায় এসে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রাজা রামমোহন রায় এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৪৫] হেয়ার ১৮১৮ সালে কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল স্থাপন করে।[৪৬] তিনি পাঠ্যপুস্তকের ঘাটতি পূরণের জন্য ১৮১৭ সালে স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮১৭ থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১০০ টাকা দান করেন।[৪৭] হেয়ারের যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগাতে সহায়ক ছিল।

৫. রবার্ট মে (?-১৮২৪): রবার্ট মে ছিলেন একজন মিশনারি, যিনি চুঁচুড়ায় (হুগলি) ১৮১৩ সালে একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৮] এই স্কুলটি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছিল। মে'র প্রচেষ্টা ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক প্রসারে সহায়ক ছিল, যদিও তার কার্যক্রম মূলত মিশনারি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল।[৪৯]

৬. কালীশঙ্কর ঘোষাল (১৭৮২-১৮৩০): খিদিরপুরের জমিদার কালীশঙ্কর ঘোষাল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করেন। তিনি কলকাতার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন।[৫০] ঘোষালের আর্থিক সহায়তা এবং সামাজিক প্রভাব হিন্দু কলেজের প্রাথমিক সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।[৫১]

৭. কলকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮): কলকাতা স্কুল সোসাইটি ১৮১৮ সালে ডেভিড হেয়ার এবং অন্যান্য সংস্কারকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল স্থাপন এবং শিক্ষার প্রসার।[৫২] সোসাইটি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য সাশ্রয়ী শিক্ষার সুযোগ প্রদান করে এবং পাঠ্যপুস্তকের প্রাপ্যতা বাড়াতে কাজ করে। এটি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৫৩]

১৮০০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে উইলিয়াম কেরি, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড, ডেভিড হেয়ার, রবার্ট মে, কালীশঙ্কর ঘোষাল, এবং কলকাতা স্কুল সোসাইটির সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাঙালি সমাজে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে। তাদের কার্যক্রম বাংলা রেনেসাঁসের সূচনা করে এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পশ্চিমা জ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগায়। এই প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো লাভ করে, যা ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৭৩১ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় গড়ে উঠা ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

১৭৩১ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সময়কালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন, মিশনারি কার্যক্রম, এবং স্থানীয় সংস্কারকদের উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা বাঙালি সমাজে প্রবেশ করে। নিম্নে এই সময়কালে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য ইংরেজি শিক্ষার স্কুলগুলির বিবরণ দেওয়া হলো, যা বাংলা রেনেসাঁস এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১. সেন্ট অ্যান্ড্রুজ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ ভলান্টিয়ার স্কুল (১৭৩১): বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টা শুরু হয় সেন্ট অ্যান্ড্রুজ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের উদ্যোগে ১৭৩১ সালে একটি অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই স্কুলটি প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৫৪] এটি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত হয়, যদিও এর কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে সীমিত ছিল।

২. ফ্রি স্কুল সোসাইটি অফ বেঙ্গল (১৭৮৯): ১৭৮৯ সালে ফ্রি স্কুল সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীতে সেন্ট থমাস স্কুল, কিডারপুর নামে পরিচিতি লাভ করে। এই স্কুলটি ১৭২৬-১৭৩১ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি চ্যারিটি স্কুলের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং ১৭৮৭ সাল থেকে এর রেকর্ড সংরক্ষিত হয়।[৫৫] এটি ব্রিটিশ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রদান করত। স্কুলটি ১৮৩৩ সালে নতুন সংবিধানের অধীনে পুনর্গঠিত হয় এবং গভর্নর-জেনারেলকে এর পৃষ্ঠপোষক করা হয়।[৫৬]

৩. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০): ১৮০০ সালে লর্ড রিচার্ড কলি ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ কোম্পানির কর্মকর্তাদের ভারতীয় ভাষা ও রীতিনীতি শেখানোর জন্য গড়ে ওঠে। তবে, এই কলেজে ইংরেজি শিক্ষাও প্রদান করা হতো, যা বাঙালি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৫৭] এই প্রতিষ্ঠানটি ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক মডেল হিসেবে কাজ করে এবং স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করে।

৪. হিন্দু কলেজ (১৮১৭): ১৮১৭ সালে রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।[৫৮] এই কলেজটি উচ্চবর্ণের হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান, এবং পশ্চিমা দর্শন শিক্ষার সুযোগ প্রদান করে। ১৮৫৫ সালে এটি প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পুনর্নামকরণ করা হয়। হিন্দু কলেজ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং বাংলা রেনেসাঁসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৫৯]

৫. স্কটিশ চার্চ কলেজ (১৮৩০): ১৮৩০ সালে রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজ (প্রাথমিকভাবে জেনারেল অ্যাসেম্বলি'স ইনস্টিটিউশন) প্রতিষ্ঠা করেন।[৬০] এই প্রতিষ্ঠানটি ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের জন্য গড়ে ওঠে এবং বাঙালি হিন্দু শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। রাজা রামমোহন রায়ের পরামর্শে এই স্কুল প্রতিদিন প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু হতো।[৬১] ১৮৪০ সালে এটি স্কুল ও কলেজ বিভাগে বিভক্ত হয় এবং ১৮৪৪ সালে ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে একীভূত হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করে।[৬২]

৬. শ্রীরামপুর মিশন স্কুল (১৮০০): ১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা ইংরেজি, বাংলা, এবং সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করত।[৬৩] এই প্রতিষ্ঠানটি ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পশ্চিমা জ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।

৭. কলকাতা মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫): ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এশিয়ার প্রথম মেডিকেল স্কুল হিসেবে বিবেচিত।[৬৪] এই কলেজে ইংরেজি মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষা প্রদান করা হতো, যা বাঙালি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সহায়ক ছিল। এটি পশ্চিমা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. লা মার্টিনিয়ার কলেজ, কলকাতা (১৮৩৬): ১৮৩৬ সালে লা মার্টিনিয়ার কলেজ, কলকাতা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ব্রিটিশ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করত।[৬৫] এই স্কুলটি ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি পশ্চিমা সংস্কৃতি ও শৃঙ্খলার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল, যা বাঙালি সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বাড়ায়।

৯. বেথুন স্কুল (১৮৪৯): ১৮৪৯ সালে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কলকাতায় হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হয়।[66] এটি বাংলায় নারী শিক্ষার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, যেখানে ইংরেজি শিক্ষা প্রদান করা হতো। ১৮৭৯ সালে এটি বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং ১৮৮৩ সালে এর প্রাক্তন ছাত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমুখী বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা স্নাতক হন।[৬৭]

১৭৩১ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি শিক্ষার স্কুলগুলি ব্রিটিশ প্রশাসন, মিশনারি উদ্যোগ, এবং স্থানীয় সংস্কারকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলে এবং বাংলা রেনেসাঁসের ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই শিক্ষা ব্যবস্থা একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো লাভ করে, যা ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৬৮]

বাঙালি মধ্যবিত্তের ইংরেজী শেখার ফলাফলসমূহ

বাংলার বাঙালি মধ্যবিত্তের ইংরেজী শেখার ফলাফল ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ বিষয়গুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর: এ সময় সমাজ থেকে যে সকল কুপ্রথা দূর করা হয়েছিল তার অন্যতম ছিল সতীদাহ প্রথার বিলোপ। স্বামীর সাথে একই চিতাই বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত দগ্ধ করার এই প্রথা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছিল। ১৮২৯

সালে খ্রিষ্টান মিশনারী, বিভিন্ন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংস্কারক এবং রাজা রামমোহনের প্রচেষ্ঠায় লর্ডণর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিং ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগেও সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা চালু ছিল না। উপরন্তু বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহসহ বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সোচ্চার হয়ে লেখনি ধারন করেন। তিনি এ সকল কুসংস্কারপূর্ণ প্রথার যে অনুমোদন হিন্দু ধর্মে নেই তার উল্লেখ করে ধর্মীয় গোত্রসমূহ থেকে অজস্র উদাহরণ উপস্থাপন করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৬ সালে Civil Marriage Act প্রবর্তন করে বিধবা বিবাহের অনুমোদন প্রদান করে এ ছাড়া এই আইনের শিশুবিবাহ ও বহুবিবাহ,কুলীন প্রথাকে নিরুৎসাহিত করা হয়।[৬৯]

ভারতীয় সমাজে মানুষে মানুষে যে শ্রেণী বিভক্তি ছিল তা বর্ণপ্রথা নামে অভিহিত করা হয়। আবাহমানকাল থেকে চলে আসা বংশানুক্রমিক বর্ণ প্রথা (Caste system) ভারতীয় সমাজের ব্যাধি স্বরূপ ছিল। এ প্রথার ফলে বিবাহ কেবলমাত্র নিজ গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। উনিশ শতকে ডিরোজিও ইয়ং বেঙ্গল দল বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার হয়। তারা তাদের প্রকাশিত সংবাদপত্রের দ্বারা বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালায়। একইভাবে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখনীর মাধ্যমে সনাতনী সমাজের উপর প্রচন্ড আঘাত হানেন। ১৮৫৪ সালে রামনারায়ণ তাঁর "কুলীনকুলসর্বস্ব" নাটক লিখে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন যে জন্মের সাথে কৌলীনের কোন সম্পর্ক নেই। ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলা থেকে বর্ণ ব্যবস্থা উৎখাত না হলেও তার প্রভাব ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ: বাঙালির ইংরেজী শেখার ফলশ্রুতিতে তারা নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি যত্নশীল হয় এবং শিক্ষিত বাঙালিদের হাতে এ সময় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ও সরকারি চাকুরেগণ এ সাহিত্যের স্রষ্টা। শেকসপীয়ার, মিল্টন, বায়রণ, বেকন, লক, বেন্থাম, গিবন, হিউম, মেকলে, বার্ক, স্পেন্সার ও মিল বাঙালী সাহিত্যিকের মনোজগৎ গঠন করে দেন। উনিশ শতকে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের হাতে ধর্মতত্ত্ব, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রহসন সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। রামমোহন রায় পাঁচটি প্রধান উপনিষদ---কেন, ঈশ,কঠ, মুন্ডক ও মান্ডুক্যের বাংলা অনুবাদ করেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর টীকা লেখেন। এ সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক আধুনিক কবি হিসেবে আর্বিভূত হন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। একের পর এক তিনি শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী,কৃষ্ণকুমারী, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য ও মেধনাদবধ কাব্যের মতো কাব্যগ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারা সংযোজন করেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে বৈশিষ্ঠ্যসমূহ তিনি তার রচিত কাব্যের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় সংযোজন করেন। এ ছাড়া এ সময়ে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন মধূসূদনের ধারাকে অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

এ সময় ছিল বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের কাল।[৭০] এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভূত ভূমিকা ছিল। তিনি শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বেতাল পঞ্চবিংশতি সাবলিল বাংলা গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে রচনা করেন। তিনি প্রথম বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার করে তার আধুনিকায়ন ঘটান। বিদ্যাসাগর বাংরা গদ্যকে সাবলীল, যাবতীয় ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলেন। একই সময়ে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি রচনা করেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা,বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী, রজনী প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে বিষয় বৈচিত্র ও ঘটনার পারস্পরিকতায়। এই সাহিত্যকর্মগুলি বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য শৈলীর প্রভাব প্রদর্শন করে।[৭১] এছাড়া দীনবন্ধ মিত্র ও গিরিশ ঘোষ অভিনব সব বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেন।

একইভাবে এই সময় পাশ্চাত্যের প্রভাবে বাংলায় শুরু হয় শিল্পচর্চা। উনিশ শতকের শেষে ই.বি. হ্যাভেল কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হন। তার প্রভাবে বাঙালী চিত্রশিল্পীগণ বাংলার নিজস্ব চিত্ররীতি ও পাশ্চাত্য রীতির সাথে সমন্বয় করে নতুন ধরনের শিল্প সৃষ্টি করেন। এই স্কুলের ছাত্র অবনীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের সংমিশ্রণে নতুন এক ধারা রচনা করেন। তার পথ অনুসরণ করে নন্দলাল বসু, অসিত কুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ অনেক চিত্র শিল্প রচনা করেন। পরবর্তীতে এ ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেন যামিনী রায়। তিনি লোকশিল্পের আঙ্গিক নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে নতুন ধরনের ছবি আঁকেন।

অর্থনৈতিক ও পেশাগত উন্নতি: ইংরেজি শিক্ষা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য অর্থনৈতিক ও পেশাগত উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। ব্রিটিশ প্রশাসনে কেরানি, আমলা, এবং অন্যান্য প্রশাসনিক পদে নিয়োগের জন্য ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অপরিহার্য ছিল। হিন্দু কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, এবং শ্রীরামপুর কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত বাঙালিরা ব্রিটিশ

প্রশাসনের বিভিন্ন পদে যোগদান করে।[৭২] এই শিক্ষা তাদের ব্রিটিশ বণিক-এজেন্ট (বানিয়ান) হিসেবে কাজ করার সুযোগ প্রদান করে, যা তাদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে। উদাহরণস্বরূপ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিরা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ব্রিটিশদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলে সম্পদ ও প্রভাব অর্জন করেন।[৭৩]

নারী শিক্ষা ও সামাজিক সমতার প্রচেষ্টা: পাশ্চাত্য শিক্ষা বাঙালি সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেথুন স্কুল (১৮৪৯) এবং পরবর্তীতে বেথুন কলেজ (১৮৭৯) নারীদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ প্রদান করে।[74] কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা স্নাতক হন, যা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সম্ভব হয়েছিল।[৭৫] এই শিক্ষা নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ সমতার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ছিল।

সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ও পরিচয়ের পুনর্গঠন: ইংরেজি শিক্ষা বাঙালি সমাজে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, যা ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সংঘাতের জন্ম দেয়। ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের মতো শিক্ষিত যুবকরা ঐতিহ্যবাহী হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেও, রামমোহন রায়ের মতো সংস্কারকরা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।[76] এই দ্বন্দ্ব বাঙালি পরিচয়ের পুনর্গঠন ঘটায়, যেখানে তারা নিজেদের ভারতীয় ও পশ্চিমা সংস্কৃতির একটি সংমিশ্রণ হিসেবে দেখতে শুরু করে।

নিজ সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি: এ সময়ের বাঙালি প্রভাবিত হয়েছিল পাশ্চাত্যের রোমান্টিসিজম চিন্তাধারার দ্বারা। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সময়কালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল রঙ্গোলাল বন্দোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র,হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মীর মোশারফ হোসেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মুখোপাধায়, কাযকোবাদ প্রমুখ লেখক বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি বাঙালির চিন্তাধারাকেও নতুন এক দিগন্তের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।[৭৭] ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়ন করার ফলে বাঙালিদের মধ্যে নিজ সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি গভীর অনুরাগ সৃষ্টি হয়। বাঙালী সাহিত্যিকদের উপন্যাস,কাব্য ও নাটকে এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটে।[৭৮] উনিশ শতকের শেষে দিকে এ মনোভাবের বিকাশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় ফলে বিশ শতকে এসে আমরা দেখি বাঙালির সমাজে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়ে তা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে।

রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদের উত্থান: ইংরেজি শিক্ষা বাঙালিদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেয়। পশ্চিমা রাজনৈতিক দর্শন, যেমন স্বাধীনতা, সমতা, এবং গণতন্ত্রের ধারণা, শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারা জাগায়। ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের নেতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মুক্তচিন্তা ও ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনার মনোভাব জাগান।[৭৯] এই শিক্ষিত শ্রেণী পরবর্তীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠার মতো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ নেয়।[৮০] ইংরেজি শিক্ষা বাঙালিদের ব্রিটিশ শাসনের শোষণমূলক নীতিগুলি বুঝতে এবং প্রতিবাদ করতে সক্ষম করে।

উপসংহার

আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ও তাদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ এক জটিল, বহুমাত্রিক সমাজ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিফলন। এ শ্রেণীর উত্থান ছিল একদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর সুযোগের সদ্ব্যবহার, অন্যদিকে ঐতিহ্য-ভিত্তিক মূল্যবোধ থেকে সরে এসে এক নতুন আধুনিকতার অনুসন্ধান। মুর্শিদ কুলী খানের রাজস্ব সংস্কার, পলাশীর যুদ্ধ-পরবর্তী ব্রিটিশ রাজস্বনীতির প্রভাব, নবাবী আমলের অভিজাত মুসলিম শ্রেণীর পতন এবং হিন্দু জমিদার শ্রেণীর উত্থান মধ্যবিত্তের পটভূমি নির্মাণ করে। এই উদীয়মান শ্রেণীটি ইংরেজি শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের পেশাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চায়। তারা ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে। যদিও এই শ্রেণীর আত্মসচেতনতা, দেশপ্রেম বা নৈতিক আদর্শের ঘাটতি নিয়ে সমকালীন মনীষীরা যেমন বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র সমালোচনা করেছেন, তথাপি অস্বীকার করা যায় না যে এ শ্রেণীই বাংলা রেনেসাঁসের সূচনা করে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাংলায় যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সূচনা হয়, তা কেবল সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়—সমাজসংস্কার, নারীশিক্ষা, কুসংস্কার দূরীকরণ, রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই নববিকাশ ধর্মান্ধতা ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও

মানবিকতা প্রতিষ্ঠার এক মাইলফলক রচনা করে। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুযোগসন্ধানী ও আত্মকেন্দ্রিক ছিল, সময়ের প্রবাহে তারাই হয়ে ওঠে জাতিসত্তা গঠনের অন্যতম চালিকা শক্তি। অতএব, বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী একদিকে ছিল ব্রিটিশ শাসনের সহযোগী শক্তি, অন্যদিকে তারাই ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকতা, জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের সূচনাকারী। এই দ্বৈত ভূমিকার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজচেতনা, যা পরবর্তীকালে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ভিত্তিকে আমূল রূপান্তরিত করে। এই শ্রেণীর বিকাশ ও তার ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তাই কেবল একটি শিক্ষাগত প্রবণতা নয়—বরং একটি বৃহত্তর সমাজ-রাজনৈতিক বিবর্তনের পরিচায়ক।

তথ্যনির্দেশ

[১] এম.এ.রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ, ১৫৮।

[২] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য,* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮), পৃ, ৪৩।

[৩] *প্রাগুক্ত*।

[৪] হাবিবুর রহমান, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ, ৫৫-৫৭।

[৫] *প্রাগুক্ত,* পৃ, ৩৮-৩৯।

[৬] Jadunath Sarkar (Edited), *The History of Bengal,* Vol. II. (Dacca,1948),p.497.

[৭] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-৯৭১, ১ম খন্ড,* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ, ৩।

[৮] *প্রাগুক্ত,* পৃ, ৪।

[৯] Karl Marx, " The British Rule in India" in *Marx Engels*, (Moscow: Progress Publishers,1988),pp.13-16.

[১০] সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* (কলিকাতা: ডি এন বি ব্রাদার্স, ১৯৮০), পৃ, ৫।

[১১] বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক,* (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২), পৃ, ২১-২২।

[১২] আ.ফ. সালাহউদ্দীন আহমদ, "উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড" সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত,* পৃ, ২৭২।

[১৩] অমর দত্ত, *উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ,* (কোলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১), পৃ, ৪।

[১৪] বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,* (ঢাকা: বুক ক্লাব, ২০০০), পৃ, ৮৯।

[১৫] *প্রাগুক্ত*।

[১৬] বিনয় ঘোষ, *বাঙলার বিদ্বৎসমাজ,* (কোলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮০), পৃ, ১০১।

[১৭] S. N. Mukherjee, "Class, Caste and Politics in Calcutta, 1815–38," in *Elites in South Asia*, ed. Edmund Leach and S. N. Mukherjee (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 35–36.

[১৮] Brian Hatcher, *Idioms of Improvement: Vidyasagar and Cultural Encounter in Bengal* (New Delhi: Oxford University Press, 2001), 22–24.

[১৯] Sumit Sarkar, *Writing Social History* (New Delhi: Oxford University Press, 1997), 169–170.

[২০] Sumanta Banerjee, *The Parlour and the Streets: Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta* (Calcutta: Seagull Books, 1989), 55–57.

[২১] David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization, 1773–1835* (Berkeley: University of California Press, 1969), 58–60.

[২২] Mukherjee, "Class, Caste and Politics," 38–40.

[২৩] Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849–1905* (Princeton: Princeton University Press, 1984), 20–22.

[২৪] Kopf, *British Orientalism*, 70–72.

[২৫] A Griffin, *Sketches of Calcutta Etc,* (Glasgow,1843), pp.45-46. উদ্ধৃত হয়েছে বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত,* পৃ,১৪৮-৪৯।

[২৬] উদ্ধৃত হয়েছে বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত,* পৃ, ১৭০।

[২৭] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "সেকাল আর একাল" *বঙ্কিম রচনাবলী* (যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত), (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৯০), পৃ. ৩৪৪।

[২৮] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বাবু," *লোকরহস্য বঙ্কিম রচনাবলী পূর্বোক্ত,* পৃ, ১২।

[২৯] শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড* (জেনারেল পাবলিশার্স, ১৯৮১), পৃ, ৪৯৬।

[৩০] *প্রাগুক্ত,* পৃ, ৪৯৯।

[৩১] উদ্ধৃত হয়েছে, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, *ঐ*।

[৩২] *প্রাগুক্ত*।

[৩৩] S. N. Mukherjee, "Class, Caste and Politics in Calcutta, 1815–38," in Elites in South Asia, ed. Edmund Leach and S. N. Mukherjee (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 38–42.

[৩৪] Sekhar Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition: A History of Modern India* (New Delhi: Orient BlackSwan, 2004), 80–83.

[৩৫] Brian Hatcher, *Idioms of Improvement: Vidyasagar and Cultural Encounter in Bengal* (New Delhi: Oxford University Press, 2001), 25–30.

[৩৬] Sumit Sarkar, Writing Social History (New Delhi: Oxford University Press, 1997), 170–173.

[৩৭] Bandyopadhyay, From Plassey to Partition, 135–140.

[৩৮] "Carey, William," in Biographical Dictionary of Christian Missions, ed. Gerald H. Anderson (New York: Macmillan Reference USA, 1998), 115.

[৩৯] Timothy George, *Faithful Witness: The Life and Mission of William Carey* (Birmingham, AL: New Hope, 1991), 89–92.

[৪০] "Serampore College," *Wikipedia*, last modified February 5, 2004, https://en.wikipedia.org/wiki/ Serampore_ College

[৪১] John C. Marshman, *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward, Embracing the History of the Serampore Mission* (London: Longman, Brown, Green, Longmans, & Roberts, 1859), 123–130.

[৪২] Marshman, *The Life and Times*, 145–150.

[৪৩] *Ibid*, 98–102.

[৪৪] "Serampore College," *Wikipedia*.

[45] "Hindu School, Kolkata," *Wikipedia*, last modified July 11, 2006, *https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_ School,_Kolkata*

[৪৬] Anasuya Adhikari et al., "And There Was Light: The Bengal Renaissance and the Pioneers in Education," ResearchGate, August 1, 2021, *https://www.researchgate.net*

[৪৭] "Nineteenth Century Bengal: Reflections of Society in Periodicals, Newspapers and Literatures," AAtoons Study, February 6, 2021, *https://www.aatoonsstudy.com*

[৪৮] David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization, 1773–1835* (Berkeley: University of California Press, 1969), 82–85.

[৪৯] Kopf, *British Orientalism*, 85–87.

[৫০] Sekhar Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition: A History of Modern India* (New Delhi: Orient BlackSwan, 2004), 80–83.

[৫১] Kopf, *British Orientalism*, 75–80.

[৫২] Adhikari et al., "And There Was Light."

[৫৩] "Nineteenth Century Bengal," *A Atoons Study.*

[54] "St. Andrew's Church," St. Andrew's Church Kolkata, accessed June 25, 2025, http://standrewschurchkolkata.in

[৫৫] W.K. Farminger, "Thomas' School, Kidderpore," *Old Calcutta* (Kolkata) Blog, May 7, 2013, http://oldkolkata. blogspot.com

[৫৬] Farminger, "Thomas' School."

[৫৭] "Fort William College," Testbook, April 22, 2025, https://testbook.com

[৫৮] "Hindu School, Kolkata," *Wikipedia*, last modified July 11, 2006, https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_ School,_Kolkata

[৫৯] David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization, 1773–1835* (Berkeley: University of California Press, 1969), 75–80.

[৬০] "College History," Scottish Church College Kolkata, accessed June 25, 2025, *http://www.scottishchurch.ac.in*

[৬১] "College History," Scottish Church College.

[৬২] "College History," Scottish Church College.

[৬৩] "History of the Calcutta University Department of English," University of Vermont, accessed June 25, 2025, http://www.uvm.edu

[৬৪] "Education in West Bengal," *Wikipedia*, last modified March 7, 2006, *https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_West_Bengal*

[৬৫] "La Martiniere College, *Calcutta*," FIBIwiki, last modified December 17, 2023, *https://wiki.fibis.org*

[৬৬] "Bethune College," Banglapedia, last modified June 17, 2021, http://en.banglapedia.org

[৬৭] Ibid..

[৬৮] "University of Calcutta," Wikipedia, last modified March 11, 2004, *https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Calcutta*

[৬৯] Sumit Sarkar, *Writing Social History* (New Delhi: Oxford University Press, 1997), 175–180.

[৭০] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খন্ড,* (কলিকাতা: আনন্দ পাবিলিশার্স, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ), পৃ, ৩৮৭।

[৭১] Anasuya Adhikari et al., "And There Was Light: The Bengal Renaissance and the Pioneers in Education," ResearchGate, August 1, 2021, https://www.researchgate.net.

[৭২] Sekhar Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition: A History of Modern India* (New Delhi: Orient BlackSwan, 2004), 80–83.

[৭৩] S. N. Mukherjee, "Class, Caste and Politics in Calcutta, 1815–38," in *Elites in South Asia*, ed. Edmund Leach and S. N. Mukherjee (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 38–42.

[৭৪] "Bethune College," Wikipedia.

[৭৫] "Bethune College," *Banglapedia*, last modified June 17, 2021, http://en.banglapedia.org

[৭৬] Sarkar, *Writing Social History,* 170–175.

[৭৭] অতুল সুর, *বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন,* (কলিকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৯৪), পৃ, ৩৩৪-৩৫।

[৭৮] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* পৃ, ৮৯।

[৭৯] Kopf, *British Orientalism,* 90–95.

[৮০] Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition,* 135–140.